হ-য-ব-র-ল এবং কগনিশন

A thesis submitted towards partial fulfillment of the requirement for the degree of

MASTER OF PHILOSOPHY IN COGNITIVE SCIENCE

Course affiliated to faculty of Interdisciplinary studies law & management

Jadavpur University

Submitted by

ASHARUL SEKH

EXAMINATION ROLLNO.:MPHFCS1904

Under the Guidance of

PROF. AMRITA BASU

School Of Cognitive Science

Kolkata- 700032

India

2019

হ-য-ব-র-ল এবং কগনিশন

A dissertation submitted to Jadavpur University in partial fulfillment of the requirement for the degree of Master of philosophy in Cognitive Science

ASHARUL SEKH

Registration No: 107615 of 2009-2010

School Of Cognitive Science

Jadavpur University

Kolkata-700032

India

May 2019

Declaration of Originality and Compliance of Academic Ethics

I hereby declare that this thesis contains literature survey and original research work by the undersigned candidate, as a part of my Master of Philosophy in Cognitive Sciencedegree during academic session 2016-2019.

All information in this document has been obtained and presented in accordance with academic rules and ethical conduct.

I also declare that, as required by these rules and code of conduct, I have fully cited and referred all material and results that are not original to this work.

Name: Asharul Sekh

Roll Number: MPHFCS1904

Thesis Title: **হ-য-ব-র়-ল এবং কগনিশন**

Signature:

Date:

Financial Assistance

This M.Phil. Thesis has been funded by University Grant Commission under NON NET Fellowship Scheme.

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমি আসারুল শেখ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কগনিটিভ সায়েন্স বিভাগের এম. ফিল দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ফিল ডিগ্রীর জন্য আমার উপস্থাপিত গবেষণাটি। আমি মাননীয় অধ্যাপিকা ডঃ অমৃতা বসুর কাছে বিশেষভাবে চিরকৃতজ্ঞ। তার সহায়তা ছাড়া আমি এই গবেষণাটি কোনভাবেই সম্পন্ন করতে পারতাম না। তিনি তার সমস্ত সুস্থতা অসুস্থতা নিয়ে তার অমূল্য সময় দিয়ে আমার এই রচনার ভুলভ্রান্তি সংশোধন করে দিয়েছেন। তিনিই আমাকে সুকুমার রায়ের ' হ-য-ব-র-ল এবং কগনিশন ' বিষয়টিতে কাজ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। বিষয়টি আমার কাছে নতুন হলেও তার সহায়তায় বিষয়টি আমার কাছে খুব সহজেই সহজবোধ্য হয়েছিল। ক্লাস থাক বা না থাক যখন কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি তখনই ম্যাম আমাকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। এছাড়াও আমি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক শীর্ষদা, আমাকে সবসময় কাজের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। এছাড়াও কুতুব ভাই ও প্রতীকদার কাছে সমানভাবে আমি কৃতজ্ঞ। আরো বলতে গেলে বলতে হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষক শাহনাজ কাজী তার কাছেও আমি সমান ভাবে কৃতজ্ঞ, তিনি তার অমূল্য সময় আমার এই রচনাটির জন্য ব্যয় করেছেন, তাই তার প্রতিও অশেষ মনপ্রিতি রইল। ম্যাম যখন না থাকে তখন এরা সব সময় পাশে থাকায় আমি কোন সমস্যায় পড়িনি। এছাড়া যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক ছোট বড় গ্রন্থাগার এবং আমাদের বিভাগীয় গ্রন্থাগারের থেকেও বিশেষভাবে উপকার পেয়েছি। আমি নিজে কখনো ভাবিনি যে আমার এমফিল ডিগ্রি সম্পন্ন করতে

পারে, কারণ আমি কয়েকবার নিজেও অনেক সমস্যায় পড়েছিলাম। কিন্তু এই মানুষগুলোর পাশে থাকার জন্য এতদূর আসতে পেরেছি। আমি তাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

সূচিপত্র :-

	বিষয় :	পৃষ্ঠা :
অধ্যায় : ১	**ভূমিকা**	
১.১.	গবেষণাটির উদ্দেশ্য	১-২
১.২	অধ্যায়ের পথরেখা	৩-৪
অধ্যায় : ২	**ননসেন্স ও সাহিত্যে ননসেন্সের ব্যবহার**	
২.১	ননসেন্স বলতে কী বোঝায়	৫-৭
২.২	সাহিত্যে ননসেন্স-এর তাৎপর্য	৮-৯
২.৩	পূর্ববর্তী গবেষণা	১০-১৩
২.৪	গবেষণা প্রশ্নের উপস্থাপনা	১৩
২.৪.১	গবেষণা সম্বন্ধিত প্রশ্ন	১৪
অধ্যায় : ৩	**যুক্তি**	
৩.১	যুক্তির প্রয়োগ	১৫
৩.১.১	আরোহী যুক্তি	১৬
৩.১.২	অবরোহী যুক্তি	১৭-১৮
৩.২	অর্থনির্মাণে যুক্তির প্রয়োগ	১৮
অধ্যায় : ৪	**কাব্যতত্ত্বের কগনিটিভ দৃষ্টিভঙ্গি**	
৪.১	কাব্যতত্ত্বের কগনেটিভ দৃষ্টিভঙ্গিকবিতায় কিভাবে ফুটে উঠে	১৯-২০
৪.২	আবেগপ্রবণতার গুণাবলী	২১
৪.৩	আবেগপ্রবণতার স্থান	২১-২৯
৪.৪	আবেগপ্রবণতায় ননসেন্স কিভাবে ধরা পড়েছে	৩০-৪২
অধ্যায় : ৫		
৫.১	উপসংহার	৪৩-৪৬
৫.২	মূল্যায়ন	৪৭-৫০
	গ্রন্থপঞ্জি	৫১-৫৩

অধ্যায় : ১

ভূমিকা :

গবেষণাটির উদ্দেশ্য : ১.১

সাহিত্যের এক অন্যরকম রসদ হল ননসেন্স সাহিত্য। যদিও ননসেন্স মানে আমরা বুঝি কোনো অর্থহীন শব্দ। কিন্তু বাস্তবিক জীবনে তার প্রভাব অপরিসীম। তবে বেশিরভাগ ননসেন্স সাহিত্যের উদ্দেশ্য হলো কৌতুক প্রদানের মাধ্যমে নির্মল আনন্দের উদ্বেগ ঘটানো। তবে সুকুমার রায়ের কিছু। ননসেন্স সাহিত্য হাস্য কৌতুকের ঘেরাটোপ পেরিয়ে আমাদের জীবনের অন্য অনুভূতি গুলিকে ছুয়ে গেছে। কখনও কখনও এই সাহিত্য নির্দিষ্ট বাধ্যবাধকতার রূপ পেরিয়ে প্রতিবাদমুখর হয়েছে। যেমন কখনও কখনও সমাজে ভণ্ডামি বেড়ে গেলে বা বর্ণ বৈশম্য বেশি পরিমান দেখা দিলে সেটাও চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন, তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থাকে।

-(Heyman Michael 2007)

তবে ননসেন্স কবিতার মাধ্যমে শুধুমাত্র যে হাস্যকৌতুক বা অর্থহীন শব্দ আমাদের কাছে বেশি ধরা পড়েছে তা নয়, এর অন্য দিকগুলো অন্যভাবে কতটা আমাদের প্রভাবিত করেছে সেটাও দেখার জন্য এর কগনিটিভ কাব্যতত্ত্ব মূল্যায়ন

করা দরকার। এক সাথে সুকুমার রায়ের কিছু কবিতার অন্তর্নিহিত অর্থের অনুধাবন করার জন্য যুক্তি তত্ত্বের প্রয়োগ ও প্রয়োজনীয়তা অবশ্যম্ভাবী।

সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও প্রতিভাবান ব্যক্তি হলেন সুকুমার রায়। তার রচিত বিখ্যাত এক ননসেন্স কাব্যসাহিত্য হল 'হ-য-ব-র-ল '। এটি ননসেন্স কাব্য সাহিত্যের এক অন্যতম নিদর্শন সব সময়ের জন্য । শিশু সাহিত্য হিসাবে এটি বহুল জনপ্রিয় ও সর্বজন সমাদৃত (অজয়-২০১৬) । অন্যভাবে বললে এটা হাসির কৌতুক হিসেবে বহুল পরিচিত। যদিও কিছু সংখ্যক গবেষক এই 'হ-য-ব-র-ল ' কাব্যসাহিত্যের অন্তর্নিহিত অর্থ বার করেছেন। ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এখানে যুক্তিটা কিভাবে সহায়ক হয়ে উঠেছে যেই বিষয়টি তারা লক্ষ্য করেছেন । এই কাব্যে হাস্য কৌতুক ছাড়াও এখানে অন্য কোনো আবেগের বহিঃপ্রকাশ আছে কিনা সে বিষয়ে এই কাব্যের, কোনো কগনিটিভ কাব্যতত্ত্বের মূল্যায়ন পাওয়া যায় না।

এই গবেষণা পত্রটির কাজ হল 'হ-য-ব-র-ল ' বলতে কি বোঝায় ? এর অন্তর্নিহিত অর্থ খতিয়ে দেখা । এছাড়াও এখানে 'যুক্তি ' সহায়ক হয়ে উঠেছে কিভাবে সেটাও খতিয়ে দেখা । একই সাথে কগনিটিভ কাব্যতত্ত্বের মূল্যায়নের মাধ্যমে অন্য যে অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে যেটাকে খুঁজে বার করা।

১.২ অধ্যায়ের পথরেখা :

প্রথম অধ্যায় :

এই অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে ননসেন্স কি? সাহিত্যে ননসেন্স কিভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় :

এছাড়াও পরবর্তী গবেষণায় এর আলোচনা কিভাবে করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় :

এখানে বলা হয়েছে, যুক্তি কি, যুক্তি কত প্রকারের, সাহিত্যে এই যুক্তির ব্যবহার কিভাবে হয়েছে, একটা কবিতার অর্থে যুক্তির ভূমিকা কি হওয়া উচিৎ। এছাড়াও 'হ-য-ব-র-ল 'এর নির্ধারিত কিছু কবিতার যুক্তি বিশ্লেষণ।

চতুর্থ অধ্যায় :

এখানে আলোচনা করা হয়েছে কগনিটিভ কাব্যতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে । কবিতা এবং তার আবেগপ্রবণতার গুণাবলী নিয়ে, সাধারণ কবিতার সাহায্যে আবেগ প্রবণতার গুণাবলীর অনুসন্ধান হয় কিভাবে সেটা নিয়ে এছাড়াও ননসেন্স কাব্যের মধ্যে আবেগ প্রবণতার গুণাবলীর অনুসন্ধান করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায় :

উপরে উল্লেখিত প্রত্যেকটি অধ্যায় সম্পর্কে আলোচনা উপর নির্ভর করে, সমস্ত বিষয়ের সিদ্ধান্ত সঠিকভাবে গ্রহণ করা।

দাসগুপ্ত অজয় (২০১৬) দুর্দিনে শতায়ু মহীরুহ মনে পড়ে, Relieved May 19,

17. from http;//www.bhorerkagoj.net /print-edition/2016/01/10/69762.php.

Heyman Michael, s.s. and Red), (2017) The Tenth Rasa : An Anthology of Indian Nonsense. Penguin Book India.

শঙ্খ ঘোষ, বন্দ্যোপাধ্যায় মানবেন্দ্র, চট্টপাধ্যায় জয়ন্তী, সরকার পবিত্র, বসু বিমান মুজমদার, স্বপন দাশ, শিশির কুমার (১৯৮০), শতায়ু মজুমদার (দাস শিশির কুমার সেন) বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন।

ননসেন্স ও সাহিত্যে ননসেন্সের ব্যবহার :

অধ্যায় : ২

২.১ ননসেন্স বলতে কী বোঝায় ?

'ননসেন্স ' হল লিখিত শব্দ বা কথা । যে, কোনো সুসঙ্গত অর্থ বহন করে না। কখনও কখনও অর্থহীন বা হাস্যকর শব্দের ব্যবহারকে 'ননসেন্স ' শব্দের ব্যবহার বলে উল্লেখ করা হয়। অনেক কবি, ঔপন্যাসিক এবং সংগীতকার তাদের কাজে, বিশুদ্ধ হাস্যকৌতুক বা বিদ্রূপের জন্য 'ননসেন্স ' ব্যবহার করেছেন। ভাষা দর্শন ও বিজ্ঞান দর্শনের মধ্যে, 'ননসেন্স ' ইন্দ্রিয়জাত অর্থপূর্ণতা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়। বিভিন্ন সময়েই ননসেন্স সাহিত্য সুসঙ্গত এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ সাহিত্য থেকে আলাদা করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। (Hewes, 2012b)

দ্য টেনথ রাসা নামক বইয়ে 'ননসেন্স ' বলতে বলা হয়েছে “ideas statements or beliefs that you think are ridiculous or not true." (Heyman Michael, 2007)

সহজভাবে বলতে গেলে, যখন থেকে ভাষা শিখতে থাকি বা জ্ঞান অর্জন করতে শুরু করি, সেটা একটা মানসিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চলতে থাকে। এই

মানসিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দর্শন, মনোযোগ এবং চিন্তন সংগঠিত হতে থাকে। এবং উপস্থিত হয় তাহলে তার অর্থ বোঝার জন্য মস্তিষ্কে তৈরি হওয়া স্থায়ী ধারণার সাথে তুলনা করি। শব্দকোষ এর সাহায্য নিয়ে শব্দটির অর্থ অনুসন্ধান করতে থাকি। পূর্ব ধারণার সাথে মিললে তাকে sense যুক্ত বা অর্থপূর্ণ বলা হয় এবং পূর্ব ধারণার সাথে না মিলে তাকে ননসেন্স বলা হয়ে থাকে। সাইকোলজির ভাষায় এটি 'টেম্পলেট ম্যাচিং থিওরি ' নামে পরিচিত। অতি সাধারণভাবে বলতে পারি যে, এটি sense-এর বিপরীত 'negation of sense'. (Beeg, 2013) ননসেন্স সর্বদা সর্বতোভাবে মানুষের সাধারণ জ্ঞান ও যুক্তি খন্ডন করতে থাকে। বিশ্বে প্রচলিত সামাজিক ধারণাকে সর্বদা খণ্ডন করতে তৎপর হয়। ("Frege, Gottlob - Sense and Reference.pdf." n.d)

হাস্য কৌতুক উদ্দীপনার জন্য ননসেন্সসাহিত্য, কবিতা ও গল্প পছন্দ করে থাকি। যদিও সুকুমার রায়, উৎপল দত্ত, মনোজ মিত্রের মতো অনেক কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকারদের কবিতা, সাহিত্য, নাটকের মাধ্যমে ননসেন্স রূপকের এক সামাজিক বার্তা দিয়েছেন।

Warren T. Greenleaf বলেছেন "The snap. They crackle. And also pop. If the books of other more staid authors are the oatmeal of children's literature - solid, nourishing, and warm, but not much fun those of Theodor Geisel are its

oatmeal of children's literature morning racket"(Principal Magazine, May 1982.)

(Hewes, 2012a, 2012b)

২.২ সাহিত্যে ননসেন্স-এর তাৎপর্য:

উনিশ শতকের গোড়া থেকে ননসেন্স সাহিত্য আলাদা ভাবে আত্মপ্রকাশ করে । এই ননসেন্স সাহিত্য দুটি প্রাচীন ধারা থেকে উৎপত্তি হয়েছে । প্রথম এবং প্রাচীন ধারাটি হল প্রচলিত লৌকিক ধারা যেটি গান, নাটক, ছাড়া ইত্যাদি । আর দ্বিতীয়টি হলো বিভিন্ন সভাকবি গবেষক ও বুদ্ধিজীবীদের বুদ্ধিবৃত্তিক বিদ্বেষ রচনা। ননসেন্স সাহিত্যে অর্থের সহজ ভাষা এবং যুক্তি এমন কিছু বিষয় দ্বারা সুষম হয় বা প্রচলিত অর্থকে অগ্রাহ্য করে। এই প্রচলিত বিষয়গুলি শব্দবিজ্ঞান, সিনট্যাক্স, ফোনেটিক, প্রসঙ্গ, উপস্থাপনা ইত্যাদি। উদাহরণ হিসাবে দেওয়া যেতে পারে, বাঙালি বিখ্যাত লেখক সুকুমার রায়ের ননসেন্স কবিতার প্রথম দুই পংক্তি-

"হস ছিল সজারু (ব্যাকরণ মানি না)

হয়ে গেল হাঁসজারু কেমনে তা জানি না।”

(রায় সত্যজিৎ এবং বসু পার্থ, ২০১৪)

কবিতাটির প্রতিটি বাক্য গঠনের দিক থেকে যেমন সম্পূর্ণ সঠিক, তেমনি জোড়কলম শব্দ গঠনের দিক থেকে এটি সম্পূর্ণ ঠিক। কিন্তু বাক্যের থেকে বা জোড়কলম শব্দের গঠনের দিক থেকে সম্পূর্ণভাবে সঠিক থাকলেও, কবিতার যে

অর্থ তৈরি হয় সেটি পূর্ব অর্জিত ওয়ার্ড ভিউয়ে আঘাত করে। কারণ ‘হাঁস’ এবং ‘সজারু’ সম্পর্কে ধারনা থাকলেও নতুন শব্দ ‘হাঁসজারু’ শব্দের কোন টেম্পলেট মস্তিষ্কের মধ্যে থাকে না। ফলে, এই নতুন যে প্রাণীটির ধারণা পূর্বে তৈরি ওয়ার্ড ভিউয়ে আঘাত করতে থাকে। অনেক সময় কিছু শব্দ গঠনগত দিক থেকে এবং অর্থগত দিক থেকে ওয়ার্ড ভিউকে আঘাত করে। (Vidal, 2008)

ননসেন্স শব্দ পাঠকের মানসিক ক্রিয়াকলাপের উপর প্রভাব ফেলে। এই শব্দগুলি মস্তিষ্ক সক্রিয় করে তোলে। অর্থহীন শব্দগুলির অর্থযুক্ত হয়ে ওঠার জন্য কোন প্রচলিত ধারণা প্রয়োজন হয় না। (Wolters, 1983). এই অর্থহীন শব্দগুলি মস্তিষ্কে এমনভাবে কোন তথ্য প্রেরণ করে যা তাদের বিষয়বস্তু থেকেই পাঠক অর্থ তৈরি করতে পারে। বেশিরভাগ ননসেন্স কবিতার ক্ষেত্রে কোন অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু, খুব কম কবি বা লেখক বাংলা সাহিত্যে আছেন যারা তাদের ননসেন্স কবিতা বা লেখার মধ্যে অনেক অর্থ লুকিয়ে রাখেন। এবং সেটা সম্পূর্ণরূপে পাঠকের উপর নির্ভর করে, যে পাঠক অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে সক্ষম কিনা।

২.৩ পূর্ববর্তী গবেষণা :

প্রিয়দর্শিনী চ্যাটার্জি তার লেখায় ননসেন্স কবিতার অন্তর্নিহিত অর্থসামাজিক ইতিহাসের কথা তুলে ধরতে চেয়েছেন। কিন্তু তার গবেষণায় সুকুমার রায়ের উল্লেখ পেলেও এবং কিছু কবিতার প্রেক্ষাপট তিনি তুলে ধরলেও, সাহিত্যের পিছনে যে সত্য বা অর্থ লুকিয়ে আছে সেটা দেখাতে চেয়েছেন। সুকুমার রায় স্বাধীনতার পূর্বের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিষয় গুলিকে ননসেন্স কবিতার আকারে লিখেছেন। প্রিয়দর্শিনী চ্যাটার্জি তার গবেষণার মাধ্যমে সুকুমার রায়ের তার গবেষণায় কবিতার সব ক'টি পংক্তি বিশ্লেষণ করে তাতেও প্রেক্ষাপট দেখা যায় না। কাব্যতত্ত্বের কগনিটিভ দৃষ্টিভঙ্গির কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। কবিতার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে যুক্তি সাহায্য করে কিনা সেটাও পাওয়া যায় না। (Scholar, 2015) ব্রিগ্রেট বেগ তাঁর বইয়ে লিখেছেন যে ইংরাজি ননসেন্স সাহিত্য কিভাবে ব্রিটিশ সাহিত্যে তার ঐতিহ্য বজায় রেখেছে তাঁর কথা তিনি বর্ণনা করেছেন। অতি প্রাচীন কাল থেকেই এই ননসেন্স সাহিত্যের কথা পাওয়া যায়। তিনি তাঁর বইয়ে ল্যুই ক্যারল সহ এডওয়ার্ড লিয়ার ননসেন্স কবিতার ইতিহাস ও প্রেক্ষাপট তুলে কবিতার

বিশ্লেষণ করেছেন। (Begg, 2013) Angelika Zirker-এর লেখাতে এডওয়ার্ড লিয়ার ননসেন্স কবিতা, যে কবিতা গুলো খাবার সংক্রান্ত জিনিস নিয়ে তার বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। এডওয়ার্ড লিয়ার ননসেন্স কবিতায় শব্দের ভাষার বিভিন্ন ব্যবহার

দেখা যায়। তিনি তাঁর লেখাতে এডওয়ার্ড লিয়ার ননসেন্স কবিতা খাবার সংক্রান্ত সমস্ত কিছু বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে ননসেন্স কবিতা অদ্ভুত সমস্ত বিষয়বস্তু গুলো হল অতিরিক্ত ভোজন, ভোজন স্বভাব, খাদ্য তালিকা ইত্যাদি। কিন্তু, বইটি ননসেন্স কবিতার অর্থ নিয়ে এবং যুক্তি নিয়ে কোন ধারণা পোষণ করেননি। অপর একটি পেপার দেখতে পাই যে সুকুমার রায়ের লেখাগুলো নিয়ে তিনি লিখেছেন, ননসেন্স সাহিত্যকে ইংরাজি সাহিত্যের মূল উৎপত্তি বলা চলে। আর ইংরেজরা কখন রাজত্ব করছিল বাংলা ননসেন্স সাহিত্য ছিল ইংরেজদের দেওয়া উত্তর। ব্রিটিশদের থেকে তাদের ঐতিহ্য নিয়ে বাংলায় সম্পূর্ণ ভিন্ন মাটিতে ননসেন্স সাহিত্যের বিকাশ সত্যিই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বড় উত্তর বলা চলে। সুকুমার রায়ের "হ-য-ব-র-ল" এর থেকে পুরনো কলকাতার চিত্র সহ বিভিন্ন বাবু কালচারের চরিত্র তার লেখাতে তিনি ধরেছেন। তিনিই সম্পূর্ণ "হ-য-ব-র-ল" -এর বিশদ বর্ণনা করেছেন, যা প্রশংসার দাবি রাখে। কিন্তু, তিনি সমগ্র "হ-য-ব-র-ল" ধরে আলোচনা করে, "হ-য-ব-র-ল"-এর কাব্যতত্ত্বের কগনেটিভ দৃষ্টিভঙ্গির কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। কবিতার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে যুক্তি সাহায্য করে কিনা সেটিও পাওয়া যায় না। (MAITI, 2016)

দ্য টেনথ রাসা নামক বইটিতে ভারতের সমস্ত অঞ্চলের প্রচলিত ননসেন্স কবিতা নিয়ে তার বিশ্লেষণ করেছেন লেখকরা। সারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের

কবিতা যেমন আছে তেমনি লোকমুখে প্রচলিত ননসেন্স ছড়াগুলির বর্ণনা পাওয়া যায়। সেখানে ভারতীয় ননসেন্স কবিতার মূল্যায়ণ করেছেন। 'দ্য টেনথ রাসা ' বইটি ভারতীয় ননসেন্স সাহিত্যকে বুঝতে অনেক সাহায্য করে। এখানে যেমন পাঠ্য বইয়ের ননসেন্স কবিতা গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তেমনি লোকমুখে প্রচারিত ননসেন্স কবিতা গুলিও তুলে ধরা হয়েছে। এই বইয়ে ননসেন্স কথা বলতে গিয়ে তিনি সুকুমার রায়ের কবিতার কথা বলেছেন। বাংলায় অনেক গুলো ননসেন্স কবিতা থাকলেও সুকুমার রায়ের কবিতা আলাদা স্থান দখল করে আছে ভারতীয় ননসেন্স সাহিত্যে। (Heyman Michael, 2007) ননসেন্স কবিতায় বিশ্বসাহিত্যে ডঃ সুস হল এক অন্যতম নাম। পরবর্তী গবেষণাপত্রটি তাঁকে নিয়ে রচনা। বইয়ে শব্দের ব্যবহার ও ভাষার প্রয়োগ নিয়ে লেখা হয়েছে এই গবেষণাপত্রটি। এই গবেষণাপত্রে আসল ডঃ সুস-এর কিছু পংক্তি ও অপরটি বানানো নকল ডঃ সসু-এর মত লেখা কিছু পংক্তি নিয়ে একটি পরীক্ষা করা হয়েছে। কিন্তু এখানেও সেই কবিতার বিশ্লেষণ ও যুক্তির ব্যাখ্যা পায়না। (thomas fensch, 2016) 'কগনিটিভ পয়েটিক্স অ্যান ইনট্রোডাকশন ' বইয়ে কগনিটিভ কাব্যতত্ত্বের বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এই বিষয়ের পাওয়া যায় বিভিন্ন ইংরেজি কবিতার কগনিটিভ কাব্য তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা। বিভিন্ন কবিতা থেকে কিছু পংক্তি নিয়ে লেখক বিভিন্ন দিক থেকে পংক্তিগুলির বিশ্লেষণ করেছেন। যেমন ' ফিগার অ্যান্ড গ্রাউন্ড ' তত্ত্বের উপর নির্ভর করে কিছু কবিতার কগনিটিভ

কাব্যতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আবার, কবিতার পংক্তি গুলোর মধ্যে কগনিটিভ ব্যাকরণ নিয়ে আলোচনা করেছেন।

২.৪ গবেষণা প্রশ্নের উপস্থাপনা :

উপরিউক্ত বই ও গবেষণাপত্রগুলি থেকে ননসেন্স সাহিত্য সম্পর্কে জানতে পারলেও, ননসেন্স সাহিত্যের কগনিটিভ দৃষ্টিভঙ্গির কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। কবিতার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে যুক্তি সাহায্য করে কিনা সেটিও পাওয়া যায় না। সুকুমার রায়ের ' হ-য-ব-র-ল ' নিয়ে কাজ সাধারণত খুব কমই দেখতে পাওয়া যায় বেশীরভাগ লেখক ও গবেষক তাঁদের বই ও গবেষণাপত্রে ননসেন্স সাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে অথবা ননসেন্স কবিতা ব্যবহৃত শব্দের ব্যবহার নিয়ে এবং ভাষার ব্যবহার নিয়ে কাজ করেছেন। কোনো বই বা গবেষণাপত্রে সুকুমার রায়ের কবিতা গুলোর যেমন কগনিটিভ বিশ্লেষণ পাওয়া যায় না, কবিতার পিছনের অর্থ খোঁজার জন্য যুক্তি ব্যবহার করে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পদ্ধতি জানা যায় না। (Stockwell peter, 2002)

২.৪.১ গবেষণা সম্বন্ধিত প্রশ্ন :

১. যুক্তির ব্যবহার করে ননসেন্স কবিতায় কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাওয়া যায় কি ?

২. সাধারণ কবিতার কগনিটিত কাব্যতত্ত্বের মুল্যায়ণের মত ননসেন্স কবিতার কগনিটিভ কাব্যতত্ত্বের মূল্যায়ন করা কি সম্ভব ?

অধ্যায় : ৩

যুক্তি :

৩.১ যুক্তির প্রয়োগ :

যুক্তির প্রয়োগ কবিতায় কিভাবে হয় সেটা জানার আগে আমাকে জানতে হবে যুক্তি কি ? যুক্তি হল এমন একটা ক্ষমতা যেটা প্রয়োগের মাধ্যমে ঘটনাপ্রবাহের বিশ্লেষণ করা হয়। এছাড়াও অনেক রীতিনীতি মূল্যায়ন করে কোন কিছুর অর্থ বুঝতে সাহায্য করে। (Kompridis-2010) যুক্তি দর্শন, ভাষা ইত্যাদির সাথে সম্পর্ক যুক্ত এবং মানব চরিত্রের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। অভ্যাসের মত ' যুক্তি ' চিন্তার একটি ধারণা থেকে অংশটির সম্পর্ক তৈরী করে। এই অভ্যাসটি ভালো মন্দ সম্পর্ক কার্যকারণ সম্পর্ক, ইত্যাদি বিচার করতে সাহায্য করে । যুক্তি, চিন্তন, রিকগনিশন, বুদ্ধি এগুলো সাথে তৎপর ভাবে যুক্ত।

যুক্তি দুই প্রকার -

(১) আরোহী যুক্তি

(২) অবরোহী যুক্তি

৩.১.১ আরোহী যুক্তি :

এই ধরনের যুক্তি তে প্রদত্ত পরিমাণের উপর নির্ভর করে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। যেহেতু এটা পরিমানের উপর নির্ভরশীল তাই ভুল হওয়ার জোর (Kompridis 2010)

যেমন -

প্রথম কাক কালো

দ্বিতীয় কাক কালো

তৃতীয় কাক কালো

অতএব, সকল কাজই কালো

এ ক্ষেত্রে সব সব কাকই কালো দেখে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় যে, সকল কাকই কালো। না হলে একটি একটি করে কাক দেখতে দেখতে একটা সামান্য সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে। বিশেষ থেকে সামান্য পৌঁছানো । কিন্তু হঠাৎ করেই যদি, এই কালো কাক দেখতে দেখতে একটি অন্য রঙের কাক দেখা যায়, তাহলেই বিষয়টি ভুল বলে প্রমাণ হবে।

৩.১.২ অবরোহী যুক্তি :

অবরোহী যুক্তি একটা এমন যুক্তি, যেখানে এক বা একাধিক বিবৃতি থেকে কোন একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। এখানে একটা সামান্য ঘটনা থেকে বিশেষ ঘটনায় আসা যায়। অর্থাৎ একটা সামান্য থেকে বিশেষ ঘটনাতে যাওয়ার জন্য যে বিশেষ যুক্তি বা পদ্ধতির প্রয়োজন হয় সেটাই অবরোহী যুক্তি (Joshua, 2013)

যেমন -

সকল মানুষ হয় মরনশীল

রাম একজন মানুষ

অতএব রাম মরনশীল

এই উদাহরণের মাধ্যমে আমরা বুঝি যে, সমস্ত মানুষই মরণশীল সুতরাং রাম একটা মানুষ সেও মরণশীল অর্থাৎ এখানে সমগ্র মানবজাতির মরণশীল কথাটি বলে সেটাকে যুক্তির দ্বারা প্রতিস্থাপিত করে সমগ্র মানুষ মরণশীল এ উপনীত হতে পারি। এই ধরনের যুক্তি অবরোহ যুক্তি বলা হয়। অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল হয়ে এই ধরনের যুক্তিকে সিদ্ধান্তে পৌছাতে হয়। উপরের দুটি

উদাহরণের দ্বারা এখানে সর্ব সত্যতা জহির হচ্ছে, সুতরাং এই সিদ্ধান্ত সর্বস্বত্ব বলে গণ্য হবে।

৩.২ অর্থনির্মানে যুক্তির প্রয়োগ :

প্রথমে কবিতার অর্থ নির্মাণ করতে গেলে জানতে হবে কবিতার যে লেখক তিনি কোন সময়ের, তখন তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থার হাল হকিকত কি ছিল, তখন সমাজের পরিবেশ-ই বা কেমন ছিল, এছাড়াও সেই সময়, ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনারও বিবেচনা করতে হবে। অর্থ নির্মাণের জন্য যে সমস্ত যুক্তি গুলোকে কাজে লাগানো হয় সেগুলোকে আগে জেনে নেওয়া উচিৎ।

যেমন -

ছিল বিড়াল,

হল রুমাল ।

এখানে সাধারণ অর্থ যেটা ফুটে উঠে সেটা হল, বেড়াল ছিল রুমাল হয়ে গেল। এখানে লাইনটি সাধারণভাবে শুনলে মনে হবে হাস্যকৌতুক ছাড়া লাইন দুটিতে আর কিছুই নেই । কিন্তু আদৌ বিষয়টি তেমন না । আসলে সেই সময় সমাজ যেভাবে ভন্ডামির ঘেরাটোপে ঘেরা পড়েছিল, সেই বিষয়টিকেই সুকুমার রায় তাঁর লেখনির ইঙ্গিতে বোঝাতে চেয়েছেন।

অধ্যায় : ৪

কাব্যতত্ত্বের কগনেটিভ দৃষ্টিভঙ্গি :

৪.১ কাব্যতত্ত্বের কগনেটিভ দৃষ্টিভঙ্গি কবিতায় কিভাবে ফুটে উঠে :

সাহিত্যের একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল কগনেটিভ কাব্যতত্ত্ব। আমরা অনেক সময় অনেক রকম কবিতা পড়ি কিন্তু সেই কবিতাগুলো কি অনভূতি, সেটা আমরা অনেক সময় বিচার করিনা। এই কবিতা গুলির যদি আমরা বিচার করতে চাই তাহলে দেখি যে, তার যে অনুভূতি সেটা বর্তমানই থাকে।

এই কবিতার লাইনগুলির যদি অর্থ নির্বাচন করতে চাই তাহলে দেখতে হবে কবি কবিতার লাইনগুলিতে কি ধরণের শব্দের প্রয়োগ করেছেন বা কবিতার একটি লাইনের সঙ্গে যে অন্য লাইনের মিল করেছেন, সেই লাইন দুটিতে কি ধরণের আবেগপ্রবণ শব্দ কবি ব্যবহার করেছেন সেটাকে দেখা। এগুলো করলে আমরা খুব সহজেই বুঝে যাবো কবি কবিতার মধ্যে দিয়ে আমাদের কি ধরনের অর্থ বোঝাতে চেয়েছে।

এছাড়াও আমরা দেখি যে কবি কখনও সরাসরি পাঠকের কাছে কবিতার অর্থ বোঝানোর চেষ্টা করে । যেমন, দুঃখ দিয়ে কবিতার মাধ্যমে দূঃখের প্রকাশ

করে কখনও সুখের মাধ্যমে সুখের প্রকাশ, আবার কখনও ব্যাথার মাধ্যমে ব্যাথার এভাবেই।

এছাড়াও আমরা কখনও কবির নির্দিষ্ট কিছু শব্দের উপস্থিতির দ্বারা ধরে ফেলতে পারি যে কবি কবিতার মাধ্যমে কি বোঝাতে চেয়েছেন। এছাড়াও কিছু কিছু শব্দের প্রয়োগ আমাদের মনকে সক্রিয় করে বুঝতে যে এটা কি ধরনের অনুভূতি কবি তার কবিতায় ফলাতে চেয়েছেন।

৪.২ আবেগপ্রবণতার গুণাবলী :

১. জ্ঞানীয় বিষয় পরিস্থিতির তাৎপর্য।

২. স্বাভাবিক শক্তি স্তর থেকে বিভাজন সুখ, রাগ বা বিষন্নতা, শান্ত।

৩.একটি অত্যন্ত সক্রিয় অবস্থায় স্পষ্ট তথ্য বা ধারনাগত তথ্যের তুলনায় কম বৈষম্যমূলক হয়।

৪. এই ধরণের তথ্য শুধুমাত্র " একজনের মনের পিছনে সক্রিয় হয়",অন্য কোন তথ্য না ভুলে।

৪.৩ আবেগপ্রবতার স্থান :

কতগুলো কবিতার মাধ্যমে আমরা বৈশিষ্ট্য গুলো দেখব -

এইখানে সময়কে যতদূর দেখা যায় চোখে

নির্জন ক্ষেতের দিকে চেয়ে দেখি দাড়িয়েছে অভিভূত চাষা;

এখানে চালাতে হবে পৃথিবীর প্রথম তামাশা

সকল সময় পান করে ফেলে জলের মতন এক টোকে;

অঘ্রানের বিকেলের কমলা আলোকে

নিড়ানি ক্ষেতের কাজ করে যায় ধীরে ;

একটি পাখির মতো ডিনামাইটের পরে বসে।

পৃথিবীর মহত্তর অভিজ্ঞতা নিজের মনের মুদ্রাদোষে

নষ্ট হয়ে খসে যায় চারিদিকে আমিষ তিমিরে;

সোনালী সূর্যের সাথে মিশে গিয়ে মানুষ আছে পিছন ফিরে।

- (আবহমান, জীবনানন্দ দাশ)

জীবনানন্দ দাশের এই কবিতাটির প্রথম দুটি লাইন পড়লে আমাদের দুটি প্রাথমিক ধারণা তৈরি হয়। এই কবিতার প্রথম স্তবকে দ্বিতীয় লাইনে ' চাষা ' শব্দের দ্বারা কি ধরণের আবেগের ব্যবহার হয়েছে তার কথা বুঝতে পারি। আবার প্রথম স্তবকের প্রথম চারটি লাইনে তথ্যের বা ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। এই লাইনগুলিতে কোনো প্রকার আবেগের কোনো বিষয়বস্তু নেই। আমরা অন্যভাবে বলতে পারি যে, এই চারটি লাইনে ভাষার ব্যবহারের মাধ্যমে আবেগের কথা বলা হয়েছে। কোন নির্দিষ্ট শব্দের দ্বারা আবেগের কথা বলা হয়নি। দ্বিতীয়ত এই বর্ণনামূলক লাইনগুলি একটি অপরটির সাথে দুটি ভিন্ন উপায়ে যুক্ত। প্রথম উপায়টি হল, তারা ঘটনার একটি অংশকে নির্দেশ করে এবং একে অপরের সাথে যুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ ঘটনার বিবরণ দেয়। অন্য উপায়টি হল, তারা প্রত্যেকেই সমান

গুরুত্বপূর্ণ অর্থ বহন করে চলেছে। ছন্দের ধরণটিকে আরো বেশি শক্তি বৃদ্ধি করে শব্দগুলো। একজন পাঠক সবসময় শব্দের ব্যবহার থেকে ও অন্যান্য আবেগের অস্তিত্ব থেকে আবেগের ধরন বের করতে সচেষ্ট থাকে। যেমন কবিতাটি প্রথম পাঁচটি লাইন থেকে আমরা পায়, নির্জন ক্ষেত্রে ‘অনুভূত চাষা’, ‘অঘ্রানের বিকেল’ ‘তামাশা' এই শব্দগুলি থেকে ‘‘স্বাভাবিক শক্তি স্তর থেকে শক্তির হ্রাস বোঝায়"। এবার যদি জানতে চাওয়া হয় এখানে যে বর্ণনা পাওয়া যায় তার থেকে কোন ধরণের আবেগ লক্ষ্য করা যায়? এর উত্তরে কোন পাঠক বলবেন না যে এটা দুঃখ ভাবাবেগ আনে। আমরা জানি আবেগ সর্বদা সাধারণ শক্তি স্তর চ্যুতি থেকে বুঝতে পারি যে কি ধরণের আবেগের কথা বলা হয়েছে। সাধারণ শক্তি স্তরের থেকে চ্যুতি ঘটলে আমরা বলতে পারি সেটি দুঃখ, অবসাদ অথবা শান্তি।

“দুঃখে আমি মগ্ন প্রভু, দুয়ার খোলা করুণা!

আমায় করো তোমার জ্যোতি, অন্তর মোর অন্ধকার।

স্বর্গ যদি অর্জিতে হয় এতই পরিশ্রম করে,

সে ত আমার পারিশ্রমিক নয়, সে দয়ার দান তোমার।”

-(রুবাইয়াত, কাজী নজরুল ইসলাম)

কাজী নজরুল ইসলামের লেখা কবিতাটি পড়লে আমাদের মনে প্রথমে যে ধারণাটি আসে, সেটি হল এটি একটি দুঃখের কবিতা অর্থাৎ, কবিতাটির মধ্যে দুঃখ নামক আবেগের কথা বলা হয়েছে। কবিতাটি পড়তে গেলে প্রথমে 'দুঃখ' শব্দটি থেকে আমাদের এই ধারণা তৈরী হয়। পরবর্তী লাইনগুলি থেকে আমাদের কোন আবেগের ধারণা তৈরি হয় না। শুধু মাত্র এই লাইনগুলির একটি ধারণা, আমাদের মনের মধ্যে সঞ্চিত হয়ে থাকে। এই সঞ্চিত তথ্যগুলি পরবর্তীতে কবিতার ভিতরের আবেগ বুঝতে সাহায্য করে। অর্থাৎ, কবিতার পরবর্তী লাইনগুলি বর্ণনামূলক। এই লাইনগুলি যেমন কোন আবেগের ধারণা আমাদের দিতে পারে না, তেমনি এই লাইনগুলি ছাড়া প্রথম লাইনে থাকা আবেগপূর্ণ কোন শব্দের উপস্থিতিতেও আমাদের পক্ষে বলা লাইনগুলি একে অপরের সাথে যুক্ত হয়ে একটি অর্থের সন্ধান দিতে পারে। কিন্তু আলাদা আলাদা ভাবে গান গুলো থেকে আংশিক অর্থ বহন করে।

কবিতার প্রথমে, আমরা 'দুঃখ' শব্দটি থেকে সম্পূর্ণ কবিতার ভাবাবেগ দুঃখ মূলক তার ধারণা তৈরি হয়। তাছাড়া কবিতার অন্য লাইন থেকে আমরা যে শব্দগুলি পেয়ে থাকি যেমন 'করুণার', 'অন্ধকার', 'পরিশ্রম', 'দয়ার', 'দান' এই শব্দগুলি প্রত্যেকটি থেকে শক্তির চ্যুতি হতে দেখতে পায়। তাই প্রতিটি শব্দের দ্বারা

আমরা দুঃখকে বুঝতে পারি। অর্থাৎ এই শব্দগুলি থেকে কবিতার আবেগ কি ধরনের সেটা বুঝতে সুবিধা হবে এবং আবেগের মাত্রা নির্ণয়ে সাহায্য করে।

“গোধূলিতে নামল আঁধার,

ফুরিয়ে গেল বেলা,

ঘরের মাঝে সাঙ্গ হলো

চেনা মুখের মেলা।

দূরে তাকায় লক্ষ্যহারা

নয়ন ছল ছল,

এবার তবে ঘরের প্রদীপ

বাইরে নিয়ে চলো।

মিলন রাতের সাক্ষী ছিল যারা

আজও জ্বলে আকাশের সেই তারা।

পান্ডু-আঁধার বিদায় রাতের শেষে

যে তাকাত শিশিজরসজল শূন্যতা-উদ্দেশে

সেই তারকাই তেমনি চেয়েই আছে

অস্তলোকের প্রান্তদ্বারের কাছে।

অকারণে তাই এ প্রদীপ জ্বালাই আকাশ পানে,

যেখানে হতে স্বপ্ন নামে প্রাণে।”

- (আকাশপ্রদীপ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতাটিতে কোন লাইনের আবেগ মূলক শব্দ (সুখ, দুঃখ, আনন্দ , শান্তি অবসাদ) ব্যবহার আমরা দেখতে পাই না। এই কবিতার প্রতিটি লাইন পড়ে আমাদের একটি সম্পূর্ণ ধারণা তৈরি হয়। এই লাইনগুলিতে কোন আবেগের বিষয়বস্তু নেই। যদি আমরা কবিতাগুলি দেখি আমরা কতকগুলি শব্দ পায়, সেগুলি হল 'আধার ' ' সাঙ্গ' ‘ লক্ষ্যহারা ’ 'পান্ডু-আঁধার ' ' বিদায় ' ' শেষে ' ' শূন্যতা ' ' অস্তলোকের ' ' আকারণে '। এই শব্দগুলি থেকে কি ধরণের আবেগের কথা বলা হয়েছে সেটি বোঝা সম্ভব। সব কটি শব্দই শক্তির হ্রাসকে নির্দেশ করছে। অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে কবিতাটিতে দুঃখ নামক আবেগের কথা বলা হয়েছে। লাইনগুলির আলাদা ভাবে অর্থ আমাদের মনের মধ্যে সঞ্চয় করে রাখে। পরবর্তীতে আবেগের ধরন বোঝা যায় এমন কিছু শব্দের ব্যবহার দেখে পাঠক বুঝতে পারে যে, কবিতাটিতে দূঃখ নামক আবেগের কথা তুলে ধরা হয়েছে।

এতটুকু তারে এনেছিনু সোনার মতন মুখ

পুতুলের বিয়ে ভেঙ্গে গেল বলে কেঁদে ভাসাইত বুক।

- (কবর, জসীমউদ্দীন)

কবিতার দুটি লাইন থেকে কোনো প্রকার আবেগ বোঝা সম্ভব না। এই তথ্য আমাদের মনের মধ্যে সঞ্চিত থাকে। পরবর্তীতে এই সঞ্চিত তথ্যটি আমাদের, কবিতার মধ্যে আবেগ বুঝতে সাহায্য করে। কবিতাটির প্রথম লাইন থেকে কোনো প্রকার আবেগের লক্ষণ আমরা বুঝতে পারিনি। যথাক্রমে দ্বিতীয় লাইনে অন্য কোন অর্থের নিদর্শন আমরা পাই না।

কবিতায় যে শব্দগুলি উপস্থিত সেই শব্দগুলি হল ' কেঁদে ' ' ভাসাইত বুক ' এইদুটি শব্দ দ্বারা দুঃখের কথা বলা হয়েছে । এই শব্দগুলি দুঃখ নামক আবেগকে নির্দেশ করছে। অর্থাৎ, কবিতায় উপস্থিত কিছু শব্দের দ্বারা কবিতার আবেগ পাঠক অনুমান করতে পারেন।

“ঝরকে ঝরকে ঝরিছে বকুল, আঁচল আকাশে হতেছে আকুল,

উড়িয়া অলয় ঢাকিছে পলয় করবী খসিয়া খুলিছে।

ঝরে ঘরবাড়ি নব পল্লব, কাঁপিছে কানন ঝিল্লির রবে,

তার ছাপি নদী পাল কল্লোলে এল পল্লীর কাছে রে।।“

রবীন্দ্রনাথের গানের এই লাইনের মধ্যে ঝরনার আকুল ব্যাকুল বিকাশ, নব পল্লবে কনক ঝিল্লির রবে দ্বারা পাঠক ধারণা লাভ করে যে, এই শব্দগুলি আনন্দের কথা বলছে। সব কটি শব্দ আনন্দের ভাবাবেগকে বোঝাচ্ছে। তাই আমরা বলতে পারি যে কবিতার লাইনগুলি আলাদাভাবে কোন ভাবাবেগ প্রকাশ করতে পারেনা । লাইনগুলি একসাথে মিলে সমস্ত তথ্য যা আমাদের মনের মধ্যে সঞ্চিত করে সেগুলি একসাথে পাঠককে কবিতাটির আবেগ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে।

উপরিউক্ত কবিতাগুলি থেকে একজন পাঠক কোন ক্ষেত্রে শুধু মাত্র শব্দের (শব্দটি যে আবেগের বার্তা বহন করে) বা কবিতায় আবেগমূলক শব্দ (দুঃখ, সুখ, আনন্দ) থেকে পাঠক কবিতার মধ্যে লুকায়িত আবেগের ধরন সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারেন। অর্থাৎ, কবিতার অন্তর্নিহিত আবেগ বোঝার জন্য কবিতায় উপস্থিত আবেগপূর্ণ শব্দসমূহ, বা আবেগমূলক শব্দের উপর নির্ভর করতে হয়। বিশেষ ক্ষেত্রে কবিতার যে লাইনগুলো কোনো প্রকার আবেগের ধারণা বর্তমান

থাকে না সেগুলো পাঠকের মনের মধ্যে একটা ধারণার সঞ্চারকরে। পরবর্তীতে সেই সঞ্চিত ধারণা থেকে পাঠক কিছু শব্দের মধ্যে লুকায়িত আবগেকে একত্রিত করে, কবিতায় কি ধরণের আবেগ ব্যবহার হয়েছে সেটি বুঝতে পারেন।

৪.৪ আবেগপ্রবণতায় ননসেন্সে কিভাবে ধরা পড়েছে :

কোন সাধারণ কবিতার মধ্যে থেকে অতি সহজে কি ধরনের আবেগ তা জানা সম্ভব কবিতার মধ্যের শব্দের দ্বারা। ঠিক তার মধ্যের শব্দের দ্বারা। ঠিক একই ভাবে

ননসেন্স কবিতার ক্ষেত্রেও ' কি ' শব্দের ব্যবহার থেকে ননসেন্স কবিতাটির আবেগ সম্পর্কে বুঝতে পারা সম্ভব ?

এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচিত ননসেন্স (হ-য-ব-র-ল- বিষয় গুলোর থেকে নেওয়া) কগনিটিভ কাব্যতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

সুকুমার রায়ের "হ-য-ব-র-ল"-তে ননসেন্সের আবেগপ্রবণতা বোঝাতে গিয়ে কবি বুঝিয়েছেন সেই সময়ের সমাজের শিক্ষকের ও শিক্ষা ব্যবস্থা। যেমন বলা হয়েছে “সাত দুগুনে কত ? - তখন উপর দিকে তাকিয়ে দেখা যায় একটা দাড়কাক স্লেট পেনসিল নিয়ে যেন কি সব লিখছে, আর একবার ঘাড় বাঁকিয়ে আমার দিকে তাকাচ্ছে, তখন আমি বললাম “সাতদুগুনে চোদ্দ”।

কাকটা অমনি দুলে দুলে মাথা নাড়িয়ে বলল হয়নি হয়নি ফেল। এর মাধ্যমে সুকুমার রায় তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার নিম্নমানের শিক্ষা কে নিয়ে কৌতুক করেছেন। যে শিক্ষার অবস্থা বা মান দিন দিন রসাতলে যাচ্ছে। যেখানে ছাত্র-ছাত্রীরা শিখতে চাইলেও শিক্ষকরা তাদের নিজের অজানার জন্য সেই শিক্ষা কাছে পৌছাতে অক্ষম।

বিষয়টি কগনিটিভ পরিস্থিতির মূল্যায়ন করার জন্য বিষয়টিতে ব্যবহৃত আবেগজড়িত বা অনুভূতি জড়িত শব্দগুলো দ্বারা কি ধরনের কগনিশনের। প্রকাশ পায় তা বিশ্লেষণ করা দরকার।

এখানে সুকুমার রায় তৎকালীন শিক্ষাব্যাবস্থাকে ব্যাঙ্গার্থে প্রতিস্থাপন করেছে। কবির বর্ণনায় আবেগজড়িত অন্তনিহিত ভাবের সঙ্গে বিভিন্ন ধরণের কগনিটিভ ক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। তিনি বলতে চেয়েছেন শিক্ষার মান দিনদিন রসাতলে যাচ্ছে। কারণ, শিক্ষা যেখান থেকে আসছে সেখানেই গলদ অর্থাৎ শিক্ষক নিজেই জ্ঞানহীন হলে শিক্ষাটাকে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ছড়াবে কি করে। যেমন, “সাত দুগুনে চোদ্দ " বলার পরেও জোর গলায় বলছে হয়নি। সুতরাং শিক্ষাটা ছড়াবে কি করে। যদি গোড়াতেই গলদ প্রমাণিত হয়। আবার বলা হয়েছে,

খাড়াই ছাব্বিশ ইঞ্চি

হাতা ছাব্বিশ ইঞ্চি

আস্তিন ছাব্বিশ ইঞ্চি

ছাতি ছাব্বিশ ইঞ্চি

গলা ছাব্বিশ ইঞ্চি

আমি বললাম কখনও হতেই পারেনা এটা তখন উনি বললেন, কেন হবে না আলবাত হবে। এবং সে সেটা প্রমাণ করতে ভিতর ঘর থেকে দরজির মাপ করা ফিতেটা এনে বলল এই দেখুন, তখন আমি দেখলাম পুড়ে ফিরতেই শুধু ছাব্বিশ ইঞ্চি লেখা আছে। অর্থাৎ এর মাধ্যমে সুকুমার রায় বোঝাতে চেয়েছেন যে তৎকালীন সমাজে ভণ্ডামির হার কি রকম ছিল । ঠকবাজ বা জোচ্চর ভরা সমাজ ব্যবস্থা থেকে বাঁচার জন্য তৎকালীন মানুষকে শিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি এমন বাণী আওড়েছেন।

শ্রী শ্রী ভূশন্ডিকাগায় নমঃ

শ্রী কাকেশ্বর কুচকুচে

৪১ নং গেছোবাজার, কাগেয়াপটি।

আমরা হিসাবী বেহিসাবী খুচরা ও পাইকারী সকল প্রকার গণনার কার্য বৈজ্ঞানীক প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করিয়া থাকি। মূল্য এক ইঞ্চি এক টাকা এক আনা। CHILDREN HALF PRICE অর্থাৎ শিশুদের অধমূল্য। আপনার জুতার মাপ, গায়ের রং, কান কটকট করে কিনা, জীবিত কি মৃত, ইত্যাদি আবশ্যকীয় বিবরণ পাঠালেই ফেরত ডাকে ক্যাটালগ পাঠাইয়া থাকি।

সাবধান! সাবধান! সাবধান!!!

আমরা সনাতন বায়সবংশীয় দাড়িকুলীন, অর্থাৎ দাড়কাক। আজকাল নানা শ্রেণীর পাতিকাক, হেঁড়ে কাক রাম কাক প্রভৃতি নীচ শ্রেণীর কাকেরাও অর্থলোভে নানারূপ ব্যবসা চালাইতেছে। সাবধান ! তাহাদের বিজ্ঞাপনের চটক দেখিয়া প্রতারিত হইবেন না।

এখানে সুকুমার রায় বোঝাতে চেয়েছেন, তৎকালীন সমাজে ভন্ড মানুষের প্রকোপে মানুষ কিভাবে পড়ত, যে মানুষ নিজে ভন্ড সে অন্য ভন্ডামি থেকে বাঁচতে আশ্বাস দিচ্ছে। আসলে সাধারণ মানুষের আসল নকলের ফারাক বুঝতে না। আসলে তাদের চোখের সামনে সব আসল সরে গিয়ে শুধুমাত্র নকল নির্বাচনের সুবিধা থাকত। তাতে মানুষের ঠকার সম্ভাবনা বেশি থাকত।

এখানে কাকের মাধ্যমে তৎকালীন সমাজের ভণ্ড মানুষের তুলনা করা হয়েছে। আর কূলিন শব্দটার ব্যবহারেই বোঝা যায় লেখক কাদের বোঝাতে চেয়েছেন। তিনি তৎকালীন সমাজের সম্মানিত ব্যক্তির রূপ ধরে কিছু মানুষ যারা তাদের বংশের অভিমানে আকুল, তাদের বলেছেন, তাদের কথা বলেছেন, যারা নিজে নীচ ব্যক্তি কিন্তু নিজের মুখ মুখোশের আড়ালে রেখে অন্য নিচ মানুষের থেকে সাধারণ মানুষকে বাচতে আশ্বাস দিচ্ছে। আর শিশুদের ' হাফ ' ফ্রি অর্থাৎ সাধারণ মানুষকে তাদের দিকে আকর্ষন করার একটা ফন্দা ওটা। যাতে তাদেরকে সন্দেহের চোখে না দেখা হয়।

এছাড়াও আপনার জুতার মাপ, গায়ের রং, কানে কটকট করে কিনা, জীবিত কি মৃত, এসব বিবরণ পাঠালে ফেরত ডাকে নাকি ক্যাটালগ পাঠাইয়া থাকে।

এখানে ভন্ডামির শেষ দেখাতে চেয়েছেন। তারা বোঝাতে চেয়েছে তারা ছাড়া বিশ্বাসের আর অন্য কোনো নির্বাচন নেই। তারা ঠকাচ্ছে তবুও লিখছে যে ফেরত ডাকে ক্যাটালগ পাঠাইয়া থাকি। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের আর সন্দেহের অবকাশ রইল না। কারণ সাধারণ মানুষ চাই শুধুমাত্র বিশ্বাস, জেটা তারা দিচ্ছে, কিন্তু ভণ্ডামির মাধ্যমে।

আবার " হ-য-ব-র-ল " লেখাটিতে দেখা গেছে, যখন ' বুড়ো ' কাককে হিসেব দেখাতে বলল তখন কাক শ্লেটখানা তুলে দেখালেন এবং সেখানে ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরে লেখা আছে –

"ইয়াদি বির্দ অত্র ওকালতনামা লিখিতং শ্রী কাকেশ্বর কুচকুচে কার্যাড়িয়ানে ইমার খেসারা দলিল দস্তাবেজ। তস্য ওয়ারিশান গনের মালিক দখলকারী সন্ত্রঅত্র নায়েব সেরেস্তায় দন্ত বদস্ত কায়েম থোকররী পত্তনী পত্তনীপাট্টা অথবা কাওলা কবুলিয়ত। সত্যতা কি বিনা সত্যতা মুনসেফী আদালতের কিম্বা দায়রায় যোপর্দ আসামী ফরিয়াদী সাক্ষী সাবুদ গয়রহ মোকদ্দমা দায়ের কিম্বা আপোস মকবাল ডিগ্রিজারী নিলাম ইশতেহার ইত্যাদি সর্বপ্রকার কর্তব্য বিদায় আবশ্যিক"

হঠাৎ বুড়ো বলল থামো থামো এসব কি বলছে উল্টো পাল্টা অর্থাৎ লেখক বোঝাতে চেয়েছেন তৎকালীন সমাজের আইন কানুন এবং আদালত পরিকাঠামো । কোনো একটা কেস যখন কোন উকিলের কাছে আসে তখন টেবিলের কাজই হোলো সাতপাঁচ বলে কেসটাকে নিজের হাতে করা। তাতে সে নিজেও জানে কোনটা ভুল কোনটা ঠিক । যেন তেন প্রকারেন কেস জেতা নিয়ে কথা। তাই তারা হিংটিং সব প্রশ্ন বকাবকি করে প্রতিপক্ষকে এবং আদালতকে ভুল বুঝিয়ে নিজের হাতে পড়ে বিষয়টা আনতে চায়। তাতে সেটা হোক সত্যতায় বা বিনা সত্যতায় তার

জেতা নিয়ে কথা । এছাড়াও সেই উকিল নিজেও আইন নিয়ে কতটা পারদর্শী সেটাও সন্দেহজনক বিষয়। এছাড়াও লেখক হিজিবিজিবিজ্-এর আগমনকে কেন্দ্র করেও তৎকালীন সমাজের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলতে চেয়ছেন যে, তৎকালীন সমাজে কিছু মানুষ ছিল যারা সবসময় অট্টহাসীর মাধ্যমে সত্যতা চেপে দেওয়ার চেষ্টা করত । আসলে তারা ফলাতে চাই নিজের কু-জ্ঞান, তারা নিজের জ্ঞান টাকেই সর্ব জ্ঞান হিসাবে ফলাতে চাই।

এরপর একটা ছাগলের গলায় ডিগ্রি নিয়ে আগমন, সে নাকি বক্তৃতা দেবেন ছাগলে কিনা খায় এ বিষয়ে, তার নাম 'শ্রীব্যাকারণ শিং'।

প্রথমে সে বলল -

“হে বালক বৃন্দ এবং স্নেহের হিজিবিজিবিজ্ , আমার গলায় সার্টিফিকেট দেখেই তোমরা বুঝতে পারছো যে আমার নাম 'শ্রীব্যাকরণ শিং' বি.এ. ' খ্যাদ্য বিশারদ '। আমি খুব চমৎকার ‘ব্যা’ করতে পারি তাই আমার নাম 'ব্যাকরণ শিং' তো দেখতেই পাচ্ছো। ইংরেজিতে লেখার সময় লিখি B.A. অর্থাৎ ‘ব্যা’। কোন কোন জিনিস খাওয়া যায় আর কোন কোন জিনিস খাওয়া যায় না সেটা আমি পরীক্ষা করে দেখেছি তাই আমার উপাধি হচ্ছে ‘খাদ্য বিশারদ'। তোমরা যে বলো - ‘পাগলে কিনা বলে ছাগলে কিনা খায়' । এটা অন্যায়। এইতো একটু আগেই এক হতভাগা বলছিল যে রাম ছাগল টিকটিকি খায়। এটা একেবারে মিথ্যা কথা, আমি

অনেক রকম টিকটিকি চেটে দেখেছি, ওতে খাবার মতো কিছু নেই।অবশ্য আমরা মাঝে মাঝে এমন অনেক জিনিস খায় যা তোমরা খাওনা- যেমন যেমন খাবারের ঠোঙা। কিংবা নারকেল ছোবড়া, কিম্বা খবরের কাগজ, কিম্বা সন্দেশের মতো ভালো ভালো মাসিক পত্রিকা। কিন্তু তা বলে মজবুত বাঁকানো কোণ বই আমরা কখনো খাই না। আমরা কচিৎ কখনো লেপ কিম্বা তোষক, বালিশ এসব একটু আধটু খাই, বলে কিন্তু যারা বলে আমরা খাট, পালং কিম্বা টেবিল চেয়ার খাই, তারা ভয়ানক মিথ্যাবাদী। যখন আমাদের মনে খুব তেজ আসে, তখন অনেক রকম জিনিস আমরা চিবিয়ে কিংবা চেখে দেখি, যেমন, পেনসিল, রাবার কিম্বা বোতলের ছিপি কিম্বা শুকনো জুতো কিম্বা ন্যাপকিনের ব্যাগ। শুনেছি আমার ঠাকুরদা একবার এক সাহেবের আঁধখানা তাবু প্রায় শেষ করে দিয়েছিল খেয়ে। কিন্তু তা বলে ছুরি কাঁচি কিম্বা শিশি বোতল, এসব আমরা কোনদিন খাই না। কেউ কেউ সাবান খেতে ভালোবাসে, কিন্তু এসব নেহাত ছোট খাটো বাজে সাবান, আমার ছোট ভাই একটা আস্ত বার সোপ খেয়ে ফেলেছিল” বলেই 'ব্যাকরণ শিং' আকাশের দিকে চোখ তুলে ব্যা ব্যা করে ভয়ানক কাদতে লাগল। তাতে বুঝতে পারলাম যে, সাবান খেয়েই তার ভাইয়ের অকাল মৃত্যু হয়েছে।

অর্থাৎ এখানে তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার রাজনীতি এবং রাজনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল সেই প্রসঙ্গ বোঝাতে গিয়ে এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করেছেন।

যেমন ছিল সমাজের শিক্ষা তেমনি ছিল শিক্ষিত ব্যক্তিরা । আর তার হাজারো আওড়ানো বাণীর মধ্যে একটাও সত্য পাওয়া মুশকিল, কারণ রাজনৈতিক চক্রের গোলাযোগ তখন প্রকট ছিল । তারা তাদের নিজের ব্যক্তিত্বটাকেই হারিয়ে ফেলেছেন । তারা সাধারণ মানুষকে মিথ্যা ভাষণের বেড়াজালে ফেলে সমাজটাকে পুরো লুটে নিয়েছে এবং আরো লুটে নিতে চাইছে। আর তৎকালীন সমাজের মানুষ ও তেমন । ওদের মিথ্যা ভাষণেই মশগুল হয়ে গিয়েছে। আসলে এখান থেকে বের হবার পথটা এতটা সংকীর্ণ যে, বেরোনোর পথটা সম্ভবই নয়।

তৎকালীন সমাজের রাষ্ট্র নেতারা যে ভন্ডামি মাধ্যমে দেশ চালাতে, সেটা এই 'ব্যাকরণ শিং' -কে দিয়েই বুঝিয়েছেন। তাদের ডিগ্রি B.A. অর্থাৎ ‘ব্যা’ আমরা সাধারণত বুঝি B.A. মানে Graduation, যে ডিগ্রি স্নাতক বা ব্যাচলর ডিগ্রি যার মন সেই সমাজে আকাশছোঁয়া। সে জানেনা এমন বিষয় কম। কিন্তু সেই রাষ্ট্রনেতাদের ডিগ্রি ‘ব্যা’ অর্থাৎ তাদের কাছে এই শিক্ষাই মূল্যহীন, যার মানই নেই। যে শুধুমাত্র একটা নেতা হওয়ার জন্য শিক্ষাটাকে মূল্যহীন করে ফেলেছে। যে কিছু খাবার খেয়েছে বলেই 'খাদ্য বিশারদ' সেটাই প্রমাণ করতে চাইছে। আসলে সব-রাষ্ট্র নেতাদেরই অবস্থা সমান তাদের একটা মন্ত্রিত্ব নিয়ে কথা। কিন্তু জানে না আসলে কিছুই।

আবার-

বাদুর বলে ওরে ভাই সজারু

আজকে রাতে দেখবে একটা মজারু।

আজকে হে যায় চামচিকে আর পেঁচারা

আসবে সবাই, মরবে ইদুর বেচারা।

কাঁপবে ভয়ে ব্যভিগুলো আর ব্যঙ্গিচি

ঘামতে ঘামতে ফুটবে আদর ঘামাচি।

ছুটবে ছুতো লাগবে দাঁতে কপাটি

দেখবে তখন জম্বি ছুরি চাপাতি।

তৎকালীন সমাজে যারা সম্মানীয় ব্যক্তি তারা আসলে যেটা বলে তোষামোদ প্রিয় ব্যক্তিরা সেটাকেই ঠিক বলে, তবে সেটা ঠিক হোক আর ভুল হোক। সেই সম্মানীয় ব্যক্তিগন সবজান্তা গামছাওয়ালা, তারা যেটাই জানি বলবে সেটায় ভুল । আর ঠিক তাদের পাশে কিছু তেলাবাজী আর তোষামদ প্রিয় মানুষ সর্বদা তাকে ঠিক ঠিক বলে গাছে চড়াই আর সেও চড়তে থাকে। তার মধ্যেও কিছু মানুষ থাকে যারা তাকে চুপ করতে বলে, কিন্তু সে আরো শুনিয়ে দেবে যেমনটি এখানে হয়েছে।

অলিগলি চলি রাম,

ফুটপাতে ধুমধাম,

কালি দিয়ে চুনকাম ।

এটাও একটা গান কিন্তু সে গায়না। গান বন্ধ করে দেওয়ার পর আবারও চলল সেই গান -

সজারু কয় ঝোপের মাঝে এখনি

ঘিনি আমার ঘুম দিয়েছেন দেখোনি ?

জেনে রাখুন পেঁচা এবং প্যাচানি,

ভাঙ্গিলো যে ঘুম শুনে তাদের চেঁচানি,

খ্যাংরা - খেচা করে তাদের খুঁচিয়ে

এই কথাটা বলবে তুমি বুঝিয়ে।

বাদুড় বলে, পেঁচার কুটুম কুটুমি

মানবে না কেউ তোমার এ-সব থুতুনি।

কুয়া কি কেউ এমন ভুয়া আধারে ?

গিন্নি তোমার হোঁৎলা এবং হাদাড়ে।

তুমি দাদু হচ্ছে ক্রমে খ্যাপাটে

চিমনি-চাটা তোপসা মুখো ভ্যাপাটে ।।

এছাড়াও নৈনিতালের নতুন আলু - এটাও একটা গান কিন্তু একটু নতুন সুরে গাইতে হয়। যেটা সবচেয়ে প্রিয় গান যেটা হল – "মিশিপাখার গান"

মিশিপাখা শিখিপাখা আকাশের কানে কানে

শিশি বোতল ছিপি কাটা সরু সরু গানে গানে

আলাভোলা বাঁকা আলো আধো আধো কতদূরে

সরু যেটা সাদা কালো ছলছল ছায়াসুরে।

যখন প্রশ্ন করা হয় এটা আবার গান হল নাকি যার মাথা ছাতা কিছুই নেই, তখন তাকে কিছুই বলতে হলে না। তোষামোদকারী ব্যক্তিও, মানে হিজিবিজিবিজ্-ই বলে উঠল, হ্যাঁ এটা খুব প্রিয় একটা গান কিন্তু গানটা ভারি শক্ত । এছাড়াও যখন সহজ গানের আবেদন করা হয় তখন তারা এই গানটা ধরে -

বাদুড় বলে ওরে ভাই সজারু

আজকে রাতে দেখবে একটা মজারু।

আসলে সবই ভন্ডামি আর এই ভন্ডামি ঘিরে তোষামোদ প্রিয় ব্যক্তিদের সঙ্গ যোগানো। লেখক তার লেখনীতে ফুটিয়ে তুলেছিল, বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা । না হলে এমন আরো অনেক কিছু মাথা চাড়া দিয়ে উঠত । তার লেখনীতে এটা কৌতুকময় হলেও, সেটা কগনেটিভ, দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখলে তার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।

আমরা জানি সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল 'কগনিটিভ কাব্যতত্ত্ব' আর সেটার বিচার এখানেও খুব সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। যখন আমরা কোনো বিষয় পড়ি তখন অনেক সময় তার মধ্যে অনুভূত বিষয়গুলি ধরা পড়েনা, সেগুলো আমরা এড়িয়ে যায় ধরতেও চাইনা। কিন্তু যদি আমরা ঠিকঠাক পর্যবেক্ষণ করি তাহলে সেটা খুব অনায়াসেই ধরা পড়বে। সুকুমার রায়ের লেখার মধ্যেও সেটাই ধরা পড়েছে। প্রথমে পড়লে মনে হবে কি সব ভুলভাল, কিন্তু পর্যবেক্ষণ করে দেখা যাবে মহিরুহুর মতো মানে দাড়িয়েছে, শুধু খুঁজতে হবে আবেগ-প্রবণ অর্থগুলো, সেটা যে কোনো রূপে থাকতে পারে একটা বিষয়ের মধ্যে। সুকুমার রায়ের সেটা ননসেন্স বা হাস্যকৌতুত সাহিত্যের মধ্যে ছিল।

অধ্যায় : ৫

৫.১ উপসংহার:

সুকুমার রায়ের এই ননসেন্স লেখাগুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করলে যে বিষয়গুলো খুঁজে পাওয়া যায় সেগুলো হল, কগনিটিভ বিজ্ঞানের অনবরত যুক্তি প্রদান।

লেখা গুলিতে দুই ধরনের যুক্তি বিদ্যমান -

১. আরোহী যুক্তি

২. অবরোহী যুক্তি

যেমন এখানে ননসেন্স বিষয়ে বিভিন্ন রকম বিষয় সুকুমার রায় তুলে ধরেছেন সেগুলি হল, 'কাকেশ্বর কুচকুচে'। এখানে কাকের মাধ্যমেই সমাজের চিত্র তুলে ধরেছেন তিনি । কারণ কাক হল সর্বজনবিদিত, এখানে কাকের যে বৈশিষ্ট্যগুলি আমরা সাধারণত জানি সেটা সর্বজনবিদিত বলে সার্বিক বচনে পৌঁছানো সম্ভব হয়। এখানে আরোহী যুক্তি হয়েছে।

International Publishers.Ltd.

Joshua, S. (2013), The Encyclopedia of Mind. Kompridis, N. (2010). So we need something else for resons of mean.

International Journal of Philosophical Studies (3) 271-295

রায় সত্যজিৎ (১৯৮৭) সুকুমার রায় India.

রায় সুকুমার (১৯২১) Nistha and Lulu.com.

কুমির বুড়ো কে বলল এটাও না, তখন বুড়ো আবার পড়তে আরম্ভ করল -

দই কম্বল

টেকো অম্বল

কাঁথা কম্বল

করে সম্বল

বোঝা ভোম্বল

বলল না না এটা না, তোমার গিন্নির নামে কবিতা, তখন বলল -

রামভজনের গিন্নিটা

বাপরে যেন সিংহীটা

বাসন নাড়ে ঝনারঝন,

কাপড় কিনে দমাদ্দম ।

এটাও না

তখন বলল –

“খুসখুসে কাশি ঘুসঘুসে জ্বর, ফুসফুসে - ছ্যাঁদা, বুড়ো তুই মর।

মাঝরাতে ব্যাথা পাঁজরাতে বাত, আজ রাত্রে বুড়ো, হবি কুপোকাত।"

এখানে তৎকালীন সমাজের অবস্থা সুকুমার রায় তার লেখনিতে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি এই বিভিন্ন ধরনের উদাহরণের মাধ্যমে এছাড়াও ব্যাকরণ সিং, কুমির, সজারু, বাদুর, রামছাগল, হিজিবিজিবিজ্ এই সমস্ত চরিত্রগুলি প্রয়োগ করে সেই সমাজের ভন্ডামি এবং ভন্ডমানুষের রূপকে সুন্দর ভাবে বর্ণনা করেছেন। তখন ভন্ডামি এতোটাই প্রকান্ড আকার ধারণ করেছিল যে, না বললেই নয়।

৫.২ মূল্যায়ন :

উপরের সমস্ত আলোচনা থেকে অনায়াসে একটা সিদ্ধান্তে আসাই যায় সেটা হলো, ননসেন্স বিষয়গুলো যতই কৌতুকময় হোক বা কৌতুক প্রিয়তা ছড়াক না কেন, এই বিষয়গুলোর মধ্যে অন্যান্য আবেগ বা অনুভূতি সুক্ষভাবে ধরা পড়ে পাঠকের মণিকোঠায়। সাধারণ কোনো লেখা যেগুলো আমরা সচরাচর পড়ে থাকি সেগুলো আমাদের সহজেই বিচারযোগ্য হয় কারণ আমরাই সেটাকে বিচার করতে পারি কোনো রকম জটিলতা ছাড়ায়।

যেমন –

"শুধু বিঘে দুই ছিল মোর ভুই

আর সবই গেছে ঋণে।"

-(দুই বিঘে জমি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

এখানে পাঠক খুব সহজেই বুঝতে পারে, কারণ পড়া মাত্রই একটা দূঃখের বিষয় আমাদের চোখে ভেসে উঠে, যেটা হাস্যকৌতুক হয়তো বা হয় না, তৎক্ষণাৎ যেটা বুঝবো সেটা নাও হতে পারে, অভ্যন্তরীণ অর্থ পৌঁছাতে

হলে বিষয়টার ভাবানুভূতি জানতে হবে সেখানে একটু গভীর চিন্তার দরকার।

যেমন --

"ছিল বিড়াল,

হল রুমাল।"

এটা প্রথমেই শোনার পর হাসি বিনা কিছুই আসবেনা যদি পাঠক একটু চিন্তাশিল না হয় । সুকুমার রায়ের লেখা এটা কৌতুকময় হলেও সমাজে তা গভীর অর্থে প্রতিফলিত হয় । যখন সেই কৌতুকময় লাইনাটির আভ্যন্তরিন অর্থে যাবে তখন বোঝা যাবে যে তিনি কত বড় অর্থে সেটাকে প্রতিস্থাপন করেছেন । তাই কৌতুকময় বিষয়টির অন্তর্নিহিত অর্থ পৌঁছাতে হলে প্রথমে তার আবেগকে স্পর্শ করতে হবে তাহলেই সেটা খুব সহজেই সম্ভব।

আবার বলা হয়েছে -

একের পিঠে দুই

চৌকি চেপে শুই

পোঁটলা বেঁধে থুই

গোলাপ চাপা জুঁই

ইলীশ মাগুর রুই

হিংচে পালং পুঁই

সান বাঁধানো ভুঁই

গোবর জলে ধুই

কাঁদিস কেন তুই।

যখন এই অবাস্তব ধরণের গানের লাইন পড়ে তার মানে করা হল, তখন আবার ধরল নেড়া-

চাঁদনী রাতের পেত্নী পিসি সজনে তলা এই খোঁজ নারে

থ্যাঁতলা মাথা বাংলা সেথা হাড় কচকচে ভোজ মারে।

চালতা গাছে আলতা পড়া নাক বুলানো কাঁথ-চুনি

মাকড়ি নেড়ে হাকড়ে বলে আমায় তো কেউ ডাকছ্ নি ।

মুন্ডু ঝোলা উলটোবুড়ি ঝুলছে দেখ চুল খুলে,

বলছে দুলে, মিনসেগুলোর মাংস খাবো তুলতুলে।

এখানে সুকুমার রায় তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন এখানে অনেকগুলো হাস্যকৌতুক ধরনের কবিতা বা সাহিত্যের অংশ তিনি সমাজের সামনে তুলে ধরেছেন , যেটাকে প্রথমে শুনলে মনে হয় এখানে কৌতুক বিনা সমাজকে দেওয়ার মত কোন অর্থ নেই, কিন্তু আসলে সেটা একদমই নয় যদি কোন সাহিত্যিক উপন্যাসিক গল্পকার সমাজের বুদ্ধিজীবী কোন সত্যি কারের পাঠক এর পর্যবেক্ষণ করে, তাহলে বুঝতে পারবে সমাজের কোন কঠিন বিষয়টিকে তিনি এই কৌতুক ও তার মাধ্যমে তুলে ধরতে চেয়েছেন । আসলে অনেক কিছু অর্থ এমন হয় যেটার আভ্যন্তরীণ অর্থে আমরা পৌঁছাতে পারি না বা পৌঁছাতে চাই না। আসলে পাঠক চাই সব সময় সহজ সরল কোন অর্থ যেটা তার হৃদয়গ্রাহী হবে কিন্তু হাস্যকৌতুক বা ননসেন্স সাহিত্যের মধ্যে সেই সহজবোধ্যতা নেই বললেই চলে তাই পাঠকের মনিকোঠায় সেটা সহজেই পৌঁছাতে সক্ষম নয় । ঠিক সেই অর্থটাই সুকুমার রায় তার ' হ-য-ব-র-ল ' বলার মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। কিন্তু যখন এর আসল অর্থ পৌঁছানো যায় তখন দেখা যায় তৎকালীন সমাজ এর ভন্ডামী যে হারে বেড়ে গিয়েছিল এবং সেই সময়ের কিছু লোক যারা মুখোশধারী এবং সমাজের অন্য সাধারণ মানুষের জীবনকেদুর্বিষহ করে তুলেছিল ফালতু বিশ্বাস এর মাধ্যমে,সেটার মুখোশ সুকুমার রায় তার ননসেন্সের মাধ্যমে খুলে ফেলেছেন তাই কিছু জিনিস আমরা জটিল ভাবে নিলেও তার সহজবোধ্যতাতে পৌঁছালে তার আসল অর্থ আমরা অতি সহজে খুঁজে বার করতে পারি।

গ্রন্থপঞ্জি:

Begg, B. (2013). Medieval Nonsense Verse: Contributions to the Literary Genre Medieval Nonsense Verse: Contributions to the Literary Genre. Frege, Gottlob Sense and Reference.pdf. (n.d.). Hewes, N. (2012a). More Than Just Nonsense Verse ?: The Language of Dr, *Seuss and Children Literacy*. Hewes, N, (2012b). More Than Just Nonsense Verse ?:The Language of Dr. Seuss and Children Literacy, 563.

Retrieved from http://digitalcommons.colby.edu/seniorscholars/563

Heyman Michael, S. S. and R. (Ed.). (2007). The Tenth Rasa: An Anthology of Indian Nonsense, penguin book india

Maiti, A. (2016). Literature and Translation Studies (ljelr) The Nonsense World Of Sukumar Roy The Influence Of British Colonialism On Sukumar Roy Nonsense Poems With Special Reference To Ha-ja-ba-ra-la .

Scholar, P. D. (2015). Tracing the " Sense " behind

Nonsense: A comparative study of selected texts of Sukumar Ray and Edward Lear Priyadarshini Bhattacharyya. International Journal of English Language Literature and Humanities, 512-524,

Thomas fensch. (2016). of sneetches and whose and the good dr. seuss. (thomas fensch thomas, Ed.) New Century Books, Vidal, C. (2008). What is a worldview ?, 1-13.

Welters, A. M. (1983). On The Idea of Worldview and Its Relation to Philosophy, 25, 1-11.

Zirker_Don't_Play_With_Your_Food_Edward_Lears_Nonsense_Cookery_and_L im ericks_l.pdf (n.d.).

রায় সত্যজিৎ, ও বসু পার্থ, (২০১৪) ' হ-য-ব-র-ল ' সুকুমার সাহিত্য সমগ্র (রায় সত্যজিত ও বসু পার্থ, Eds.)

(Vol. এক) ।

রায় সুকুমার, ' হ-য-ব-র-ল ' (প্রথম)

সত্যজিৎ রায় (n.d.) যখন ছোট ছিলাম আনন্দ পাবলিশার্স ।

stockwell peter. (2002). cognitive politics an introduction.

Heyman Michael, s.s. and Red). (2017) The Tenth Rasa :

An Anthology of Indian Nonsense. Penguin Book India.

শঙ্খ ঘোষ, বন্দ্যোপাধ্যায় মানবেন্দ্র, চট্টপাধ্যায় জয়ন্তী - সরকার পবিত্র, বসু বিমান মুজমদার স্বপন দাশ শিশির কুমার (১৯৮০), শতায়ু মজুমদার (দাস শিশির কুমার সেন) বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন।

International Publishers.Ltd.

Joshua, S. (2013), The Encyclopedia of Mind. Kompridis, N. (2010). So we heed sometinings else for reasons of mean.

International Journal of Philosophical Studies (3) 271-295 রায় সত্যজিৎ (১৯৮৭) সুকুমার রায় India.

রায় সুকুমার (১৯২১) Nistha and lulu.com.